KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 12/2 15/2 15/3 17/2 18/2	Year of Publication : Dec 1946 March 1950 (বৈশাখ ১৩৫৭) Dec 1952 Feb 1954
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

পঞ্চদশ বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

প্রবন্ধ

আজকের দিনে বীরবল
অরুণকুমার সরকার

সাঁওতাল গান
সুরজিৎ সিংহ

কবিতা

বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, মণীন্দ্র রায়, দেবদাস পাঠক,
মুকুল ভট্টাচার্য, দেবব্রত সেনগুপ্ত, জয়ন্তী সিংহ, অরবিন্দ গুহ
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বটকৃষ্ণ দে, নরেশ গুহ

সমালোচনা
নরেশ গুহ

বার্ষিক চার টাকা

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

পুরোনো সংখ্যা

পরিবর্তিত তালিকা

১৩৪৪	পৌষ, চৈত্র
১৩৪৫	আষাঢ়, চৈত্র
১৩৪৬	আশ্বিন
১৩৪৮	আশ্বিন, কার্তিক, চৈত্র
১৩৪৯	আশ্বিন, পৌষ
১৩৫০	আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ
১৩৫১	আশ্বিন, চৈত্র
১৩৫২	আষাঢ়

প্রতি সংখ্যা এক টাকা
সবগুলি একসঙ্গে ২৫% কম
[মাশুল স্বতন্ত্র]

সম্পূর্ণ সেট

একাদশ বর্ষ	৩৲
দ্বাদশ বর্ষ	৪৲
ত্রয়োদশ বর্ষ	৪৲
চতুর্দশ বর্ষ	৪৲
একাদশ ও দ্বাদশ একসঙ্গে	৫৲
একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ একসঙ্গে	৮৲
চার বছর একসঙ্গে	১০৲

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

সুমিত্রার অপমৃত্যু ৪৲

মনোলীনা ২৷৷০

বিচিত্র হৃদয় ২৲

সেতুবন্ধ ২৷৷০

অপরূপা ৷০

THE WISDOM OF AN ANCIENT
SAGE RENDERED BY
A MODERN MASTER

CONFUCIUS

The Unwobbling Pivot & The Great Digest translated with notes & commentary by

EZRA POUND

Handsome Indian Edition: Rs. 2/8/-
Published for
KAVITABHAVAN
by
ORIENT LONGMANS LTD.
17, Chittaranjan Avenue, Calcutta 13
Nicol Road, Ballard Estate, Bombay
36 A, Mount Road, Madras.
Also available at Kavitabhavan.

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

কবিতা

পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৭ ক্রমিক সংখ্যা ৬৫

জল দাও

বিষ্ণু দে

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারো আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরস সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে

ও বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিম্বা তারো আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোলমোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল বাগানে

কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিম্বা বইয়ের আশ্রয়ে
কিম্বা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সম্বিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেল ফুল।

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোল্‌মোরের সাবেক জৌলুষ—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্নমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে' খুঁজে' যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কতো ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিম্বা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মরীয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিম্বা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন্ দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছ সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কতো সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিম্বা দগ্ধ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কতো চেলিউস্‌কিন হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার

অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্ত সেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিম্বা সবাই বেশি কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কেউ বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে

আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়

এবারে উঠেছে হাওয়া, ধোঁয়া নেই, দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে, বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায়
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণ চাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার, পূর্ণিমা, তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিম্বা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সস্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিম্বা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান

কিম্বা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিম্বা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখান এবং আহ্বান

কিম্বা বুঝি মোহানার গান
হুগলীর নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারানের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের।

অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
আন্দোলন সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মিনিটে আভঙ্গ আতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
বলা যায় জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো
কিম্বা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীরে আরালে কিম্বা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে

সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
উর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

—

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
মরীয়া বন্যার যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা,
আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই,
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী, অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে,
তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

দু'জন

জীবনানন্দ দাশ

(১৯৩৪-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু পরিবর্তিত)

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো ;—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো
পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন ম'রে যেতে হয়,
হয় না কি ?'—ব'লে সে তাকালো তার সঙ্গিনীর দিকে ;
আজ এই বিকেলের মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভ'রে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এলো—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু
একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বত্থের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ঘাসের উপর ঝ'রে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ;—চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝ'রে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে : 'পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝ'রে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের,—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরোতো না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
এই ব'লে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের ভিড়ে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপরে তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হ'লো : 'এই নারী—অপরূপ,—খুঁজে পাবে
নক্ষত্রের তীর ;
যেখানে রবো না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা.
কুয়াশা রবে না আর,—জনিতা বাসনা নিজে—বাসনার
মত ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

সাঁওতাল গান

১

নীল পাহাড়, সবুজ পুকুর, ঠাণ্ডা জল,
ময়না করিসনে কোয়েল পাখি,
বন্ধু আমার স্নান করবে।

২

জোড়া ঘূর্ণী ছুটে এলো উপরদেশ থেকে,
বারান্দায় তুলোর পাঁজ তৈরি—
খবরদার! ঘূর্ণী হাওয়া উড়িয়ে নেবে।

৩

ঢোল বাজে নাগড় বাজে রাস্তায়।
আমি জলের ঘাটে ছিলাম,
সেই শুনে মজে গেলাম,
জলের ঘড়া তুলতে গিয়ে ফাটল।

৪

আমি নদীর এপারে,
তুমি নদীর ওপারে,
আমায় ভালোবাসো তো ?
আমায় ভালোবাসো তো ?
দাও না তবে কদম ফুল গায় ছুঁড়ে।

৫

পথে-পথে চলেছি,
মধ্যিপথে বাবলা গাছ।
গাছে ব'সে স্বর্ণপুঁথি পড়বো,
পুরোনো বন্ধুকে পাবো।

৬

যতদিন বিয়ে হয়নি
সারা রাত নেচেই কাটতো,

এখন ছেলেপুলে নিয়ে
কত রাত চিন্তায় ভোর।

৭

শ্রাবণ মাসে শুকনো হোলো
ভাদ্র মাসে বর্ষা এলো
হায় রে হায় স্বর্ণ চিতা!
ধান মরল
মানুষের প্রাণ মরল।

৮

বেটা হইল বড়,
তার বৌ আসবে ঘরে।
আমার মন এত খারাপ কেন?

৯

ছোটো ছিলাম যখন বিয়ে দিলে।
বাবা আমায় দেখবে এসো একবার,
কুদনা * কত ঢিলে হ'লো।

১০

এত বড় পৃথিবী
জ্বলছে দুটি তারা।
জনম কালেও দুটি তারা হে ভগবান!
মরণ কালেও দুটি তারা হে ভগবান!

১১

কাকী কাকী কাকীমা
একটু ছায়া একটু রোদ।
থাকতো যদি আমার মা;
জোড়া পাল্কি চ'ড়ে যেতাম
চামর চৌদলও দুলতো।

* হাতের বালা

১২

ছোটো ছিলাম যখন বিয়ে দিলে বাবা!
আমার জনম ঘরের দিশা নাই।
পথের ধারে জেলের ছেলে,
জেলের ছেলে বাৎসল্যে দিলো
আমার জনম ঘরের পথ॥

('হিরো' পরবের গান)

১

বৃষ্টি পড়ে জিপির জিপির
বৃষ্টি পড়ে হেথায় হোথায়
মাছ চলেছে বিরিং বিরিং।
কাকী চল মাছ ধরি যাই কুম্বেডে,
কাকী চল মাছ ধরি যাই জিজিরে।
মাছের ঝাঁক চললো
চললো নদী বেয়ে,
কুম্বেড ভাঙলো, জিজির ভাঙলো
মাছের ঝাঁক কোথায় গেলো ভেসে।

২

কোথাও কাঠ নেই
কোথাও পাতা নেই,
ঝোপজঙ্গল সাফ
বনজঙ্গল সাফ।
এখন তবে নুন বেচো
তামাক পাতা তাও বেচো,
গিরিলপির বাজার কত দূর?

৩

একটা সেলেট
একটু কাগজ,
নামটি লিখে রাখো।
তোমার আঙিনায়
আমার আঙিনায়
খেজুর মাথা নাড়ে দুলছে পেঁপে গাছ।
ফল নিয়ে বেচবো তামা দিয়ে কিনবে,
পাতা তুলে বেচবো সোনা দিয়ে কিনবে।
ঝড় উঠলো পুবে রে,
ঝড় উঠলো পশ্চিমে,
আমার পেঁপে গাছ রে, তোমার গাছও প'ড়ে গেলো।

৪

হিরিজিরি পুকুরে সিরিসিরি দিখিতে
সিরিসিরি দিখিতে হিরিজিরি পুকুরে
কী সুন্দর ফুল রে, কী সুন্দর ফুল।
সেই ফুল তুলতে
সেই ফুল নিতে রে
দুই রাক্ষস ব'সে আছে
সেই ফুলে হাত রেখে রে।
তুললো তারা ফুল রে
ছিঁড়লো তারা ফুল রে,
কিন্তু ফুল ঝ'রে গেলো
রোদ্দুরে শুকিয়ে গেলো।

'হো'দের গান

(মাঘে পরবের গান)

১

বনের ভিতর অড়র গাছ
(হাওয়ায় দোলে)
লেসেকেন লেসেকেন
হাওয়া এলো পুব থেকে
হাওয়া এলো পশ্চিমের
দোলে গাছ দোলে পাতা হাওয়ায় দোলে
লেসেকেন লেসেকেন ॥

২

ইশ কী গরম, উঃ কী রোদ্দুর,
তবু আম গাছে পাতা গজায় না তো।
নতুন বৌ আসে, নতুন বৌ এলো,
তবু আম গাছে পাতা গজায় না তো।

৩

চাঁইবাসা থেকে পিতলের বাঁশি
কলকাতা থেকে সোনার বেহালা,
বলো তুমি রাখবে কথা রাখবে তো?
ও, বাঁশি ভাঙবে?
বেহালা ফেলে দেবে?
তবে তোমায় উল্টে ফেলে ঘাড় ভাঙবো।

৪

দুই বনের মাঝে রে
সিম সিরুং ফলেছে,

ঘেঁষাঘেষি কত রে
সিম সিরুং ফলেছে।
যাঃ! এ তো সিরুং না,
সিম না, সিরুং না,
মেয়ের দল দাঁড়িয়ে আছে রে।

৫

মোড়লের আঙিনায়
মোড়লের আঙিনায়
কাঁসার বাসন ঝনঝনিয়ে বাজে।
না, এ তো বাসন না,
কক্‌খনো বাসন না,
মোড়ল তার মাইনে গুনছে ব'সে।

৬

বনের ধারে অড়র গাছ
বনের ভিতর অড়র গাছ
রোদ্দুরে নেতিয়ে পড়েছে।
না রে না রোদেও না,
না রে না বনেও না,
আমার পরান অড়র গাছ
কিসের টানে নেতিয়ে পড়েছে।

৭

ও মাইলগেলের * সুন্দরী
তোমায় দেখে পরান আমার কী আনন্দে নাচে।

তুমি খিলখিলিয়ে হাসো,

* গ্রামের নাম

সে-সুর আমার কানে আসে
তোমায় আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাবো।

উঁচু নিচু রাস্তা বেয়ে চলো
মাঝে-মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে,
তোমার চলা দেখে-দেখে
পরান আমার কী আনন্দে নাচে।

কলাপাতার সবুজ তোমার গায়ে।
তোমার মনও মজেছে তো, মজেছে তো?
একটু তবে সবুর করো আমার তরে।

লঙ্কা যেমন টকটকে লাল, টুকটুকে লাল,
সিংবোংআ কী সুন্দরই না বানিয়েছেন
কী সুন্দরই বানিয়েছেন তোমায়!

বাচ্চা জন্তু চলেছে, কখনো পিছন পানে চায়,
হিংস্র জন্তু তার পিছনে ধায়॥

ও সুন্দরী সোনার মেয়ে,
সখির দলে তোমার খেলা
মাছের খেলা গঙ্গানদীর জলে।

রক্তরাঙা গোলাপফুল
বাতাস তার গন্ধ বয়ে আনে
তোমার মাথায় সে-ফুল দেবো গুঁজে॥

ও সুন্দরী, মাইলগেলের সোনার মেয়ে,
একটিবার আমায় কিছু বলো,
তবে তো প্রাণ নাচে আমার আনন্দে।

তুমি নাটালফুলের মতো শাদা
জ্বলছো তুমি পূর্ণিমার চাঁদ ॥

তুমি শালুক ফুল,
তোমার হাসি বাঙালি মেয়ের মতো ॥

ও সুন্দরী, ওগো আমার সোনামতী
আমায় যদি ভালোবেসেই থাকো
তবে চলো একসঙ্গেই চলো।

ভূমিজদের গান

১

বাগানবাড়ির ভিতরে
তিতির স্নান করে বাবা!
গায়ে লাল মাটি মাখে
তিতির স্নান করে!

২

খেজুর খেজুর!
হিলে না দোলে না দাদা
খেজুর খেজুর!
গিরে পড়িল
খেজুর খেজুর!
বানে ভাসিল
খেজুর খেজুর!

সুরজিৎ সিংহ

যাকে চাই

মণীন্দ্র রায়

যাকে চাই সে তো এক নয়, খুঁজি তাই নিশিদিন ;
মিশি মেলাহাটে, কপাটের খিলতোলা ঘরে ঘরে ;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার গানে সুর বেলাবালুকায় লীন,
রেখার চূড়ার মিনারে মিনারে নীলমুঠি ধরে।

পিদিমের শিসে লালের কালিমা, ছায়া কালো কালো,
ছায়া ঘোমটার টানে রাঙে মন, রঙ ঝিকিমিকি
সন্ধ্যার লালে নীল ঝিলিমিলি পাতায় মিলালো,
আনত হিজলে ভেজা হাওয়া কাঁপে, খুশি ভরে দীঘি
শিহরে সবুজ ঢেউয়ে, পাড়ে পাড়ে ঘাসের শিথানে
ঘুমপাড়ানিয়া দোলা লাগে, খোলে রূপসীর চুল
হঠাৎ প্রেমের জোয়ারে, কোমরে বাহুর খিলানে
বুকে মুখে টানাচোখে ক্ষণিকের কালের পুতুল।

যাকে চাই, শত উর্বশী পলাতকার বেশে
স্খলিত আঁচলে স্মৃতি তার সারা বাংলাদেশে ॥

প্রথম আষাঢ়

দেবদাস পাঠক

অবশেষে বৃষ্টি এলো। যখন ক্লান্ত মনের
দুকূল ছাপিয়ে কান্নার ঢেউ, থরোথরো দিন—
রাত্রির ব্যথা দুঃসহ। মেঘ পলাতক ; আর
রুক্ষ রক্তিমা দিগন্তে। দূর পলাশবনের
পাতায় হলুদ বেদনার ছাপ লাগলো। মলিন
সন্ধ্যার চোখ কাকুতি-করুণ। বৃষ্টির ছাঁট
তখনই লাগলো জানালায়। এলো প্রথম আষাঢ়।

শার্সি ছলোছলো, পাগোল হাওয়ার
দাপাদাপি আমার ঘরে, আর ঝরোঝরো জল
বাইরে। মনের অন্ধ গলিতে থামলো,
কান্না থামলো। নামলো অন্ধকারে
বুক জুড়ে এ কী সান্ত্বনা—যেন মমতার ঢল
হিসেবের বাঁধ ভাঙলো। ময়লা পাটিগণিতে
কাগজের নৌকো ভাসিয়ে হৃদয় সহসা ময়ূর।

একুশ

মুকুল ভট্টাচার্য

এবার গ্রীষ্ম একুশে পড়লো।
হায়রে কোথাও নেই কোরক
আমের-জামের। তাহোক, তাহোক,
আমার গ্রীষ্ম একুশে পড়লো।
যেদিকে তাকাই শুকনো পাতার
ঝরা রাশি আর
রুক্ষ ধুলো।
তাহোক, তাহোক,
আমার বৃন্তে গ্রীষ্মে কোরক :
কোন পাখি কবে ফেলে গেছে তার টুকরো খড়।
সেই খড় উড়ে আমার গ্রীষ্মে উঠলো ঝড়!
কিছু নেই আর কিছু নেই—
হায়রে একুশ পেয়েছো এই
পোড়া পৃথিবীর শুকনো ধুলোর রুক্ষ ঝড়।
ফেলে-যাওয়া যতো টুকরো খড়!
তাহোক, তাহোক,
আমার বৃন্তে একুশে অবাক এ কার কোরক ?
চেয়ে-চেয়ে দেখি কৃষ্ণচূড়ার
উল্লাস আর
তোমার হাতের টুকরো খড়।
সেই খড় উড়ে আমার গ্রীষ্মে উঠলো ঝড়!
হাওয়ায় টান,
রৌদ্র জ্বালায় প্রখর গান।
কবে ফেলে গেছো তোমার হাতের টুকরো খড়,
গ্রীষ্ম আমার একুশে এবার উঠলো ঝড়।

অখ্যাত

দেবব্রত সেনগুপ্ত

আলোর বিশ্বাস নিয়ে
একবিন্দু সত্য কাঁপে
আকাশের অন্ধকারে জেলের নৌকায়;
ভেসে যায়—
দিনের বিশ্বাস নিয়ে রাত্রির আঁধারে
দূরে চ'লে যায়।
মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে কাছে ভেসে আসে
মুহূর্তের অবকাশে চোখে দেখা যায়।
আবছায়া লাল আলো জেলেদের গায়।
মাঝ-দরিয়ায় দোলে
খ্যাতির আলোকে ভোলে
জাহাজের বিশাল ভূগোল।
আলো ভাঙে ছায়া হ'য়ে, চিকমিক জল
ছলছল
জোয়ারের উদ্দাম ঢেউ
জাহাজের পায়ে বৃথা মাথা কুটে মরে,
খ্যাতির আলোকে জ্বলে সফরী জাহাজ,
অবুঝ জোয়ারে এ কী বিনীত উচ্ছ্বাস।
সেই ফাঁকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নাচে
দুঃসাহসিক জেলে ডিঙি
সত্যের শপথ নিয়ে,
বিন্দু-বিন্দু আলো নাচে দুলে-দুলে
ব্যঙ্গ করে নদীর জোয়ারে।

তবু আশা বেয়ে চলে ওরা খ্যাতিহীন—
ছাড়ায় নদীর সীমা।
মুছে যায় অবিরল জলে
এ-তুচ্ছ প্রভেদ,
দূরের পারের ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে
প্রাণের সংকেত।

চিঠি

জয়ন্তী সিংহ

উতলা বাতাস এলোমেলো,
হে প্রিয়তম,
আজ সন্ধ্যায় লিখবো কি চিঠি
গভীরতম !
স্বর্ণচাঁপার গন্ধে মাতাল স্মৃতি
(মনের পাথরে চাপা-পড়া যত কঙ্কাল)
এলোমেলো হাসে কী যে কথা কয় চাঁদের আলোয়
পৃথিবী আজকে কাঁপছে দেখি
তারও কি লাগলো নেশা !
রাতের পাখির অঝোর প্রলাপ ঝরছে দূরে
তারও বুঝি এই পেশা।
আমিও হঠাৎ খাপছাড়া চিঠি
(মূল অর্থটি তুমি বুঝে নিয়ো, প্রিয়)
লিখতে বসেছি পতন ঘটছে ছন্দে
সব কথা আজ ঝিমঝিম করে
স্বর্ণচাঁপার গন্ধে।
আজ সন্ধ্যায় ঝাপসা স্মৃতির
জের টেনে নিয়ে লিখবো কি ফের সুনিপুণ কৌশলে !
একদিন রাতে লেকে
(হয়তো বছর দশেক আগে)
আবোলতাবোল কত কী যে বলেছিলে
রাকার আলোয় চোখে চোখ রেখেছিলে
সময় কেটেছে প্রলাপ ব'কে

ভবিষ্যতের নক্সা এঁকে
সেই রাত্রির লেকে !
পূর্ণ চাঁদের মদির আলোয়
ঘাসের শিশিরে শাদায় কালোয়
মনের তুলির বিচিত্র টানে
আলপনা এঁকেছিলে—
সেই কথা ভেবে লিখবো কি চিঠি
বলো তো প্রিয়,
পাঠাবো এ-চিঠি যার কাছে, তার
মন কি সেখানে ব'সে আছে আর—
মূল অর্থটি না যদি বোঝো তো
ফেরৎ দিয়ো।

তোমার চোখ

অরবিন্দ গুহ

হাওয়ায়-হাওয়ায় কতো গান আমি গেয়েছি হেঁকে।
আষাঢ়ের জল জানালার 'পরে ঝরেছে বেঁকে,—
আঁকাবাঁকা জল মনের এ-কথা অন্ধকারে,

মেঘ জ'মে ওঠে আকাশে ও ঘাসে, মাঠের পারে।
হাজার চোখের কথা শুনায়েছে পথের লোকে :
তোমার চোখের মতো দুটি চোখ পড়েনি চোখে।

মালতীলতায় দুপুর ঘুমায় হাওয়ার সুরে ;
হাতে হাত ধ'রে গোল হ'য়ে যারা নেচেছে ঘুরে
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে অনেক দূরের ছায়ার গানে ;

কাজল চোখের সে-ছায়া যে কার কেউ কী জানে।
হাজার চোখের গল্প বলেছে হাজার লোকে :
তোমার চোখের মতো কালো চোখ দেখিনি চোখে।

রঙিন ঝিনুক সমুদ্দুরের কিনারে আঁকা,
ঢেউয়ের ফোঁটায় শামুকের রং আধেক ঢাকা।
স্বপ্নে তোমার কান্নায় ঘুম ভেঙেছে কতো :

তোমার কান্না আমার ঝিনুকে ঢেউয়ের মতো
হাজার চোখের কথা ব'লে গেছে হাজার লোকে :
তোমার চোখের মতো দুটি চোখ পড়েনি চোখে।

টবের গাছ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কতবার উঠেছি নেমেছি।
তোমার ঘোরালো সিঁড়ি স্তব্ধতায় ভরা,
আমার যত না আনাগোনা
কোনোদিন প্রতিধ্বনি তোলেনি সেখানে।
সিঁড়ির শেষের ধাপে টবের মাটিতে
কী এক সৌখীন চারাগাছ
এ-উদাস নিয়মের সাক্ষী হ'য়ে আছে।

এই গাছ এতদিন দেখেও দেখিনি।
তোমার মনের ছাই ব'য়ে নিয়ে চ'লে যেতে-যেতে
এ-গাছের সামনে সেদিন
অন্য মনে ফিরে তাকালাম।
অপুষ্পক গাছ
বোবা পত্রপুঞ্জে তার কোনোদিন শিশির ঝরে না,
অরণ্যমর্মর থেকে নির্বাসিত এই এক দরিদ্র জীবন।
এই গাছ ছায়া দিতে জানবে না,
অপ্রতিভ ফেরৎ পাঠাবে
দক্ষিণে হাওয়ায়।
জানাবে না নিমন্ত্রণ,
কিংবা অভ্যর্থনা,
মৌমাছিরা ফিরে যাবে,
ব্যর্থ হবে ঋতুর বাহার।
কত ব্যর্থ তার আয়ু

কোনোদিন বুঝবে না নিজে।
আমিও বুঝি না
তোমার সিঁড়িতে এই চারাগাছ কেন যে রেখেছো,—
বুঝেও বুঝি না এতদিনে।

ব্যর্থতা

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের বহু স্বপ্ন
পৃথিবীর অনুর্বর মাঠে
বুনে বুনে ব্যর্থ হলে পর
নামে পাখিদের
ঘুমোবার রাত।
ধূসর ছায়ায় বোজে
নীড়ের কপাট।

সে-ব্যর্থতা ভেসে আসে
আমাদের ঘরে,
নামে অন্ধকার।
চেতনার অতন্দ্র গভীরে
স্বপ্নের অঙ্কুর তোলে
ক্ষীণ আর্তনাদ।

চুপ ক'রে ব'সে থাকি,
ঘিরে আসে গভীর বিষাদ।
তবু দূরে আলোর আকাশ,
তবু দূরে উজ্জ্বল আকাশ,
পাখিদের সাথে এই
আমাদের একটু তফাৎ।

তিনটি কবিতা

বটকৃষ্ণ দে

কথা

ছোটো-ছোটো কথা। টুকরো ঢেউয়ের মতো
হালকা দেখতে।
তবু কতো ভারি।
কথা যে হৃদয় তাই
এতো তার দাম,
তাই তাকে নিয়ে আজো অস্থির চলছে নিলাম!

নাম

এই নদী, এই ঢেউ কতোবার ছুঁয়েছে তোমায়!
স্বেচ্ছায় দিয়েছ ছেড়ে তোমার তুমি-কে তার হাতে।
বালির শরীরে আঁকা লোনা কতো নাম,
তার দাম
দিয়েছ অনেক বার তুমি।
আমি শুধু তার নীচে আরো দু'টি বর্ণ বসালাম।

স্পর্শ

বেতের লতার মতো থরোথরো স্রোতে-কাঁপা মন
সকালে ফুলের মতো ছুঁয়েছি যখন,
তখনই হাওয়ার সুরে পাপড়িতে পাতায়
হৃদয় শিশির হ'য়ে আলগোছে যায় ঝ'রে যায়।

শান্তিনিকেতনে ছুটি

নরেশ গুহ

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে বসে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল,
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয় তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায়?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়—
—দেরি হোক, যায়নি সময়?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা-লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাস
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙা-ভাঙা গলা
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে?
ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেল : ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?

আজকের দিনে বীরবল

অরুণকুমার সরকার

মেজাজটা মজলিসী হলেও, প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবটা ছিল যুক্তিবাদী তার্কিকের। সাম্নে একজন প্রতিবাদী খাড়া না-থাকলে, লেখায় তিনি তেমন জুত পেতেন না! শুধু-যে তাঁর প্রবন্ধের বেলাতেই একথা খাটে, তা নয়। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলিও মূলত কথোপকথন-নির্ভর, তর্কবিতর্কের ঠাসবুনুনিতে সময়-সময় আধা-প্রাবন্ধিক।

আত্যন্তিক যুক্তিনিষ্ঠা আবেগের স্বতঃস্ফূর্তিকে প্রতিহত করে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিই-যে প্রমথ চৌধুরীর মনোজগতে সর্বেসর্বা হবে, তা তো জানা কথা। কিন্তু এর ফলেই কিনা জানি না, সংলাপসৃষ্টিতে অসামান্য কুশলী হ'য়েও তিনি নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হননি; কাব্যকলার ক্ষেত্রে তাঁকে আঁটোসাঁটো চতুর্দশপদীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল; আর, সত্যি কথা বলতে, নির্ভুল ব্যাকরণ এবং বিস্ময়কর চাতুর্য সত্ত্বেও, হার্দ্য কবিতা একটি-দুটির বেশি তিনি লিখে উঠতে পারেননি; এবং, সম্ভবত গল্পেও নয়, আত্মপ্রকাশের অবলম্বন হিসেবে প্রবন্ধেই তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন।

'অপেক্ষাকৃত',—কেননা, প্রাণ যা চায়, আমার মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী তা কদাচিৎ লিখে ওঠবার ফুরসত পেয়েছেন। বস্তুত, নিজের জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক সংকল্প ছিল পারতপক্ষে সংস্কৃত শব্দের দ্বারস্থ না-হয়ে, কথ্য ভাষা আর সংলাপী ভঙ্গিমায় সর্বজনবোধ্য সাহিত্য রচনা করা। কিন্তু কলমে হাত দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ বাঙালী যে-ভাষায় বাক্যালাপ করে তা হুতুম পেঁচার খিস্তিখেউড় মাত্র: সে-ভাষায় হাটবাজার চলে,

বীরবলের হালখাতা: প্রমথ চৌধুরী; বিশ্বভারতী। তিন টাকা

চিন্তা করা যায় না এবং ইতিপূর্বে কেউ ক'রেও যায়নি, কেননা মনন-ক্রিয়ার ব্যাপারটা প্রাক্-ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই একচেটে ছিল, এবং সংস্কৃতই ছিল তাঁদের তত্ত্বালোচনার অবলম্বন। সুতরাং সংকল্পসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রমথ চৌধুরীকে সম্পূর্ণ নূতন একটা রাস্তা তৈরি ক'রে নিতে হয়েছিল; এবং সেই নির্মাণকার্যের গুরুতর পরিশ্রমে তাঁর সাহিত্যিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর গদ্য-যে বহু চেষ্টায় তৈরি-করা অভিনব বস্তু,—অত্যধিক অহংচেতনায় কখনো অতি-সপ্রতিভ, কখনো বা নববধূর মতো আড়ষ্ট,—এই অস্বস্তি-কর সত্যকে গোপন করার জন্য প্রায়ই তাঁকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। তাই বীরবলী গদ্যে, সাহস ক'রে ব'লেই ফেলি, স্রোত নেই। মনে হয় ভারি বুটজুতো প'রে একদল সৈনিক কুচকাওয়াজ করছে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মাপাজোখা, একঘেয়ে এবং মন্থর। রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবলের রচনা একসঙ্গে পড়লে আমার বক্তব্যটা, আশা করি, স্পষ্টতর হবে:

'সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা—এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।' (বীরবলের হালখাতা—১২৭ পৃঃ)

'হচ্ছে' এবং 'করা'—এই দুটি ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আজকাল আমাদের কানে সহ্য হওয়া সহজ নয়। অথচ ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তিতে সর্বদাই-যে বাক্যের কাঠামো হতশ্রী হয়, এমন নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' নামক পুস্তকের জন্য

রবীন্দ্রনাথ যে-ভূমিকা লিখেছিলেন, তা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করছি :

'আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব-স্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ, তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে, মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন, মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাসচে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বলচে, "অদৃষ্ট!" '

বাংলা শব্দের উচ্চারণে উচ্চাবচতা বা এ্যাক্‌সেণ্ট না থাকায় তা একান্তভাবেই বানানের গাঁটছড়ায় বাঁধা। এদিকে প্রাকৃত বাংলা শব্দকে তদ্ধিতপ্রত্যয়ের অধীনে আনা এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। এই অবস্থায় বাক্যের ছন্দলীলাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রধানত ধ্বনিমুখর সংস্কৃত যুগ্মশব্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন, প্রমথ চৌধুরী তেমনি জোর দিয়েছিলেন প্রাকৃত বাংলার হসন্তবহুল ক্রিয়াপদের উপর। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এই দুই রীতির আশ্চর্য সমন্বয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার বীরবলের অধিকাংশ রচনা আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে, ১৯১০ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ইতিপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিদ্যাসাগরী গদ্যের বহিরঙ্গে বেশ কিছু রদবদল ঘটে গেলেও, সেই সময়কার সাধুভাষা প্রকৃতপক্ষে বর্ণচোরা ইংরিজি বাক্যের তর্জমা বই আর কিছুই ছিল না। বাংলা গদ্য-যে বিধর্মী ইংরেজ পাদ্রীদের সৃষ্টি, আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্কৃত শব্দের নামাবলী জড়িয়ে এবং সংস্কৃত বৈয়াকরণকে তক্তাউসে বসিয়ে সেই কেচ্ছা ঢেকে রাখবার চেষ্টা চলছিল। আর মজা এই যে, বিকল্পের অভাবে, এই দোআঁশলা বাক্যগঠন-

রীতিতেই সাধারণ বাঙালী পাঠকের কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম বাংলার খাঁটি বাক্‌বিন্যাসরীতিকে তন্নিষ্ঠভাবে, আলালী গ্রাম্যতা পরিহার ক'রে, সাহিত্যিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও সেই বাক্‌বিন্যাসরীতির প্রচলন ছিল শহরের শিক্ষিত কয়েকজনের মধ্যেই, তবুও তার গড়নে বাঙালিয়ানার ছাপ অধিকতর সুস্পষ্ট বৈকি। বলা বাহুল্য, ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের পোষাক বদলেই প্রমথ চৌধুরী ক্ষান্ত হননি ; সে-কাজ তো রামা-শ্যামাই করতে পারত। সরাসরি মৌখিক রীতির অনুসরণে বাক্যগঠন ক'রে, গল্পে প্রবন্ধে বাংলার প্রচলিত বোলবুকনি, প্রবাদপ্রবচনকে মার্জিতভাবে প্রয়োগ করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তাছাড়া, বাংলার সুদূর কাব্য-কাহিনীর ঐতিহ্যে স্নান করলে নবজাত বাংলা গদ্যের জড়ো-যে পুষ্পিত হয়ে উঠবে, প্রমথ চৌধুরীই তা সর্বপ্রথমে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তার ফলেই তো উপনিষদের দিক থেকে আমাদের ঘাড় ফিরল ঈশ্বর গুপ্তের গ্রাম্যতার দিকে নয়, আলালী অসভ্যতার দিকেও নয়, ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যের দিকে এবং শিক্ষিত গদ্য তার যথার্থ কুলপঞ্জীর সন্ধান পেল।

আমার অনেক সময় মনে হয়েছে ভাষাসংস্কারকার্যই যদি প্রমথ চৌধুরীর অদ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ত, তাহলে তিনি তাঁর গদ্যকে নিয়ে অনায়াসেই ভেল্‌কি খেলাতে পারতেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। কিন্তু বীরবল, আগেই বলেছি, মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন ; লেখার আনন্দে আগড়ুম বাগড়ুম লিখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না ; সুষ্ঠু, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে রূপ দেবার তাগিদেই তিনি কলম ধরেছিলেন। দুর্ভাগ্যত, অশেষ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে সেতুরচনা করতে তিনি সমর্থ হননি। যে কোনো প্রকারে রচনাকে সর্বজনবোধ্য করতেই হবে, এমন একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ফলে, সবল হতে গিয়ে প্রায়ই তিনি তরল হয়ে পড়েছিলেন, মাঝে-মাঝে একেবারে জলবত্তরল, এবং এইজন্য

মানসিক খুঁতখুঁতুনিতে আজীবন তিনি অশান্তি ভোগ ক'রে গেছেন। 'দু'-ইয়ারকি' নামক প্রবন্ধগ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর আক্ষেপ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: 'এ প্রবন্ধ ক'টি যতদূর পারি সহজ ক'রে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সহজবোধ্য হয়নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি, তার চাইতে বেশি দোষী আলোচ্য বিষয়।' বস্তুত, এই ভণিতার প্রয়োজন ছিল না। কেননা আপ্রাণ সরলীকরণের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত 'দু-ইয়ারকি'র অবস্থা দাঁড়িয়েছে না ঘর্‌কা, না ঘাট্‌কা। বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী লেখার গড়নও-যে বদলানো দরকার, প্রমথ চৌধুরী তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, যথাযথ অবস্থায় বীরবলী ভঙ্গিতে তন্নিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নয় বলেই, প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষীকে মুখ্যত টীকাটিপ্পনীর প্রায়-সাংবাদিক জগতে আজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে; বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ক্ষুরধার, শ্লেষ-কটাক্ষে তির্যক ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত টুকরো-টুকরো কয়েকটি কথা ছাড়া আর কিছুই তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি; আর সেই সব কথা তুখোড় আড্ডায় কফির টেবিলে বসে পেয়ালা-পিরিচে অবলীলার সঙ্গে ঢেলে দেওয়া গেলেও, লঘুকরণেই তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে একজন জাত-সাহিত্যিক শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভাষাসংস্কারক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

'জাত-সাহিত্যিক',—কেননা, বস্তুত বীরবল ছিলেন লেখকদের লেখক। তাঁর গদ্য যাঁদের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জনের হাতে বীরবলী গদ্য নিঃসন্দেহেই পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে; দ্বিতীয় জন, রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবলের মধ্যে সেতুরচনা

ক'রে নিজের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন; তৃতীয় এবং চতুর্থ জন, আমার বিবেচনায়, বীরবলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মুদ্রাদোষ হিসেবেই কেবল আয়ত্ত করতে পেরেছেন। আর বীরবলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না হয়েও, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নূতন প্রকরণের সন্ধান করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু। এঁরা দু'জনেই বুঝতে পেরেছেন গদ্যও কবিতার মতো কান দিয়ে শোনবার, একটি শব্দের কম-বেশিতে বাক্যের তাল কেটে যায় এবং তার ছন্দ এবং বাঁধুনির জন্য সময়বিশেষে ইংরেজি বাক্‌বিন্যাস-রীতির আশ্রয় নেওয়াই লাভজনক। গদ্যের আদর্শ-যে তৈলচিত্র নয়, ভাস্কর্য—এঁরা তা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই একাধারে বীরবলী রেখাশিল্প ও রাবীন্দ্রিক রূপক-উপমা-অলংকারকে নির্মমভাবে পরিহার করতে এঁদের কষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় তন্নিষ্ঠ আলোচনার উপযোগী 'সাহিত্যিক' গদ্যের আদর্শ এঁদের হাতেই সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একটা অবয়ব পেয়েছে। হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলে-যে তাঁর জাতও যাবে, পেটও ভরবে না, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ-কথাটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন। তাই স্বল্পসংখ্যক পাঠক নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে, বুদ্ধদেব বসু বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী লেখার ঢঙ বদলাতে কখনোই ইতস্তত করেননি। বৈচিত্র্যময় তাঁর আঙ্গিক: হালকা রচনায় একরকম, তন্নিষ্ঠ প্রবন্ধে অন্য প্রকার, ছোটোগল্পে আবার ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, বাংলাদেশের আর কোনো লেখকই বুদ্ধদেব বসুর মতো এতো বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে এমন আশ্চর্য আর সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। সম্প্রতি 'তিথিডোর' নামক উপন্যাসে তিনি যে-গদ্য ব্যবহার করেছেন তা শুধু অভিনবই নয়, ঐতিহাসিক। অন্য এক দিক থেকে প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয় অবনীন্দ্রনাথ, যদিও তাঁর গদ্য সম্পূর্ণ অন্য জাতের, ভিন্ন স্বাদের। বীরবলী ভাষা যদি হয় ড্রয়িংরুমের, অবনীন্দ্রনাথের ভাষা তাহলে বৈঠকখানার। একদিকে যদি থাকে

কাউচ, অন্যদিকে ফরাস ; একদিকে ডিক্যান্টার, অন্যদিকে আলবোলা। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যেমন আধা-তদ্ভিষ্ঠ ব্যক্তিগত রচনার উপযোগী, অবনীন্দ্রনাথের ভাষা তেমনি রূপকথা সৃষ্টির একমেবাদ্বিতীয় মাধ্যম। বীরবলের কবিতাও-যে অনুপ্রাণিত ভক্তের সন্ধান পেয়েছিল, বিষ্ণু দে'র তেরজারিমা এবং ত্রিওলেটী ঢঙের কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। যে-চোদ্দমাত্রার কবিতায় বাংলা দেশে বিষ্ণু দে'র কোনো জুড়ি নেই, প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলিতেই তার সম্ভাবনা উপ্ত ছিল।

গদ্যের প্রাথমিক লক্ষ্য যেহেতু আপাতউদ্দেশ্যসাধন, তাই দিনে-দিনে তার ভোল বদলায়। কিন্তু বীরবল যা করেছিলেন তাকে ভোল বদলানো বলা যায় না, তাকে বলা যেতে পারে খোল-নলচে পাল্টে দেওয়া। হাজারো অসুবিধাকে অস্বীকার ক'রে একাধারে ব্যবহারযোগ্য এবং শিল্পশুদ্ধ গদ্য লেখার বিস্ময়কর বৈপ্লবিক প্রয়াস হিসেবে তাঁর রচনা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আসল কথা হল এই যে তাঁর সংক্রামক দুঃসাহস রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গদ্যলেখকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ঋজু চরিত্রে দোলাচলবৃত্তির স্থান ছিল না ; তৎকালীন আরো অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির মতো দু'নৌকোয় পা দিয়ে আজীবন তিনি বিশুদ্ধ ভণ্ডামির পরিচর্যা ক'রে যান নি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্তঃসারকে আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন ব'লে ফিরিঙ্গিয়ানার প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। এদিকে স্বদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধকে তিনি কখনো জোলো স্বাদেশিকতায় রূপান্তরিত হতে দেননি। কোদালকে কোদাল বলবার সৎসাহস ছিল ব'লেই একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত। তাই বীরবলের হালখাতায় শুধু-যে একজন শব্দক্রীড়ের সাক্ষাৎ পাই তা নয়, একজন সর্বসংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারীকেও আবিষ্কার করি।

সমালোচনা

ইন্দ্রধনু
উর্বশী
রূপমঞ্জরী
} কানাই সামন্ত। জিজ্ঞাসা, কলকাতা। ৩, ৩, ২৲

নতুন কবির সংখ্যা বাংলাদেশে হয়তো বেড়েছে, কিন্তু নতুন কবিতার বই সে-রকম বাড়েনি। কাজেই আধুনিক কবিতা পড়তে হলে দু'তিনটি সাহিত্য-পত্র আর নয়তো বহুপাঠে ম্লানমলাট কিছু পুরোনো বইয়ের শরণ নিতে হয়। ছিঁড়ে গেলে, কি আরো সৌভাগ্যবশত আস্ত কোনো বই হারিয়ে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই আর-একখানা প্রথম সংস্করণই আনিয়ে নেওয়া চলে। কেননা কবিতা যাঁরা এখনো লেখেন আর যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে কাদের দল ভারী সেটা ঠিক বলা যায় না। এ-অবস্থায় নতুন বই ছাপাতে পারেন একমাত্র তিনিই, যিনি দুঃসাহসী তো বটেই উপরন্তু ভাগ্যবান। ফলে প্রতিবেশী কবিদের এতে মনোকষ্ট বাড়ে, পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস চাপেন। এই রকম ঈর্ষাসঞ্চারী ভাগ্যবান কবি হচ্ছেন কানাই সামন্ত। একখানা নয়, দু'খানা নয়, একসঙ্গে তিন-তিনখানা বই প্রকাশ করে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ১৩৩২ সাল থেকে পঁচিশ বছর ধরে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছেন তা থেকে নিয়ে এই বই তিনখানি গ্রথিত। তিনখানিই কাগজে ছাপায় প্রচ্ছদপটে লোভনীয়।

তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রকৃতি। জীবনের, বিশেষত সমসাময়িক জীবনের বিচিত্র জটিলতা নিয়ে তাঁর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। একমাত্র বিশ্ব-প্রকৃতির লীলাই তাঁর কবি মনে সাড়া জাগাতে পারে। কবি হিসেবে সেটাই তাঁর বিশেষত্ব। এত ফুল, এত পাখি, আর এত গাছপালার নাম সম্প্রতি আর কারো কবিতায় পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। চোখ ভ'রে, মন ভ'রে প্রকৃতিকে এরকম একনিষ্ঠভাবে তিনি ভালোবাসতে শিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থেকে। আর সেই সব কবিতায় বৈরাগ্যের একটি অনতিব্যক্ত বিষণ্ণ সুরের ধারা প্রচ্ছন্ন।

বলার এমন কথা পৃথিবীতে অল্পই আছে যা আর কেউ আর কখনো, কোনো-না-কোনো উপলক্ষে না বলেছেন। তাতে কী এসে যায়! বিষয়ের

মধ্যে তো কবিতা নেই। কবিতা আছে সুরে, বলায়, রচনার বৈশিষ্ট্যে। একই বিষয়ে একশো কবিতা পড়ার পর সেই বিষয়েই নতুন আর-একটি কবিতা পড়ে আমরা তাই মুগ্ধ হ'তে পারি। এখানেই আসে ভাষার কথা, ছন্দের কথা, উপমা-ব্যঞ্জনার কথা। কানাই সামন্ত এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে উদাসীন।

কবিত্ব করতে তাঁর যে সংকোচ নেই কবির পক্ষে এটা নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা। কিন্তু তাই ব'লে—তড়াগ, বরিষ, শিহরি, রনিছে, ঝলকে (ঝলকায় অর্থে), হেরি, উছাসি প্রভৃতি অচল শব্দ তিনি কেমন ক'রে অসংকোচে বসান ভেবে পাই না। এই ত্রুটি যেখানে নেই সেখানেই তাঁর রচনা উপভোগ্য। যেমন :

ভিজে দুটি ডানা নেড়ে নীলকণ্ঠ পাখি
চকিতে মিলালো আম্রবনের ছায়াতে
বাদলের প্রাতে।

অনেকটা চীনে বা জাপানি কবিতার ধরন। 'ইন্দ্রধনু'র অনেক রচনা মনে হয় যেন গানের জন্য লেখা। 'উষসী'তে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা বিষয়ে কিছু দীর্ঘ কবিতা আছে। কিন্তু 'রূপমঞ্জরী'র সমস্ত কবিতাই ছোটো মাপের। এই চালের কবিতা বাংলায় কম। 'স্ফুলিঙ্গ' বাদ দিলে, দু-চার লাইনে আঁটোসাটো সম্পূর্ণ কবিতা কিছু পাওয়া যাবে হেমচন্দ্র বাগচীর রচনায়। আলোচ্য কবিরও এ-দিকে হাত আছে মনে হয়। তিনি 'রূপমঞ্জরী'তে চীনে ও জাপানি কিছু অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩ আর ২৪ সংখ্যক কবিতার ভিন্ন অনুবাদ আছে অজিত দত্তের 'কুসুমের মাসে'র নতুন সংস্করণে। পশ্চিমী কবিতার প্রভাব বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রবল। কেউ-কেউ পূর্বপন্থী হলে বৈচিত্র্য বাড়ে।

নরেশ গুহ

ছোটোগল্প

গ্রন্থমালা

পৌষ ১৩৫০-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম তেরোটি সংখ্যা নিঃশেষিত।

১৪.	অভাগীর স্বর্গ মেঘ-মুক্তি	পূর্ণশশী দেবী
১৫.	রেল-লাইন	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
১৬.	যশোমতী মর্মর	অনসূয়া দেবী দেবীপদ ভট্টাচার্য্য
১৭-১৮.	একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা	বুদ্ধদেব বসু
১৯.	সাবিত্রী নতুন লেখক	পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী
২০.	হাসন সখী	অন্নদাশঙ্কর রায়
২১.	মহাপ্রাণ	কমলাকান্ত
২২.	মুমুক্ষা	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩.	মুক্তি	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
২৪.	ঊর্মিলা	পুষ্প বসু
২৫.	গামাসুস জাতির কথা	রাজশেখর বসু
২৬.	পুনরুত্থান	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২৭.	অপরূপা	প্রতিভা বসু
২৮.	আলো, আরো আলো	মসতি বেঙ্কটেস আয়ঙ্গার
২৯.	একটি কি দুটি পাখি	বুদ্ধদেব বসু
৩০.	ভবতারণবাবু মেয়েরা	পরিমল রায়
৩১-৩২.	পার্টির পরে	ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড
৩৩.	বেনামী বন্ধু	বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪-৩৬.	তপতীর মন	নরেশ গুহ

'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা', 'পার্টির পরে'
'তপতীর মন' প্রত্যেকটি আট আনা।
অন্যান্য সংখ্যা পাঁচ আনা ক'রে। সবগুলি সংখ্যা একসঙ্গে **পাঁচ টাকা।**
এই গ্রন্থমালা সম্পাদনা করেছেন প্রতিভা বসু।

কবিতাভবন : ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

KAVITA

(Poetry)

CALCUTTA
Vol. 15, No. 3, Serial No. 65

Editor : Buddhadeva Bose. Published quarterly by Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29. Yearly 6 s. 6 d. or 1 dollar 50 cents, Post free.